ATHENA, VOLUME VI, JULY 2022 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 142-148
www.athenajournalcbm.in

হরধাম, বৈদ্যপুর ও আনুলিয়ার জমিদার বাড়ি

সুজিতকুমার বিশ্বাস*

প্রাপ্ত: ২৮/০২/২০২২ পরিমার্জন: ৩০/০৩/২০২২ গৃহীত: ২৬/০৬/২০২২

সারসংক্ষেপ: *আমাদের দেশের স্বাধীনতার পূর্বে এই দেশের বিভিন্ন প্রদেশে জমি ও সম্পদ রক্ষায় অনেকের হাতে দায়িত্ব হস্তগত হয়। জমিদারি, জমির স্বত্বাধিকারী তার পরিবর্তিত রূপ। মোগলদের বাংলা জয়ের পর জমিদার একটি বিশেষ অধিকারের এর মালিকানা হয়ে ওঠে। এই বাংলা বা এই জেলা তার ব্যতিক্রম নয়। এর বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে ওঠে জমিদার তন্ত্র। হরধাম, বৈদ্যপুর ও আনুলিয়া তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে মাঝারি মানের জমিদারেরা ছিলেন। রাজপরিবারের সূত্র ধরে তারা জমিদারি প্রাপ্ত হন বলে সেই রাজতন্ত্রের ধারা তাদের মধ্যেও অব্যাহত ছিল। অট্টালিকা, প্রবেশ তোরণ, হাতি-ঘোড়া, পূজা-পার্বণ একাধারে জনকল্যাণ ও অন্যদিকে প্রজাপীড়ক সহজেই চোখে পড়তো। সময়ের নিয়মে সেইসব জমিদারতন্ত্রের অবসান ঘটে সরকারি আইনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু থেকে যায় সেইসব রক্ষণশীল ও প্রজা হিতকারী পরিবারগুলি। সম্পদের ভগ্নাংশ অবশেষে আর পালন করার কেউ থাকে না। তবু সেই সব স্মৃতিগুলি চিরদিন থেকে যায় স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুধু চিনে রাখে জমিদার বাড়িকে।*

সূচক শব্দ: *জমিদারি, অধিকারের মালিকানা, হরগ্রাম বৈদ্যপুর আনুলিয়া, জমিদার তন্ত্র, জমিদারির অবসান, ভগ্ন অবশেষ স্মৃতি, আঞ্চলিক ইতিহাস।*

* জেলা কো-অর্ডিনেটর, নদিয়া জেলা সমগ্রশিক্ষা অভিযান দপ্তর।
e-mail: pedcordnadia@gmail.com

ফারসি শব্দ যামিন (জমি) ও দাস্তান (মালিকানা) -এর বাংলা অপভ্রংশের সাথে দার সংযোগে 'জমিদার' শব্দের উৎপত্তি। মধ্যযুগীয় বাংলার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যারা ভূমি অধিপতি হিসেবে নিজেদের পরিচিত করেছিলেন তারাই 'জমিদার' নামে অভিহিত হয়েছেন। তাদের পরিচয় জ্ঞাপক হিসেবে শব্দটি ঐতিহাসিক পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত। মোগল আমলে যারা খাজনা সংগ্রাহক ছিলেন তারাই জমিদার পরিচিতি পেয়ে থাকত। জমিদারেরা শুধু খাজনা আদায়ের অধিকারী কিন্তু কখনই জমির অধিকারী নন। মোগলদের বাংলা জয়ের পর জমিদার একটি বিশেষ পদবী শ্রেণি হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের জমি ও অধিকারের মালিক হয়ে উঠতেন তারা। ইচ্ছা করলেই তখন যে কেউ জমিদার হয়ে উঠতে পারতেন। অঞ্চলভেদে তখন নানা স্তরীয় জমিদার তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন ও প্রজা হিতৈষণার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। আমাদের এই বাংলায় তখন বিভিন্ন পরগনায় বড় বড় জমিদার ছিলেন। আবার অন্যদিকে তাদের অধস্তন অনেক ছোট ও মাঝারি মানের জমিদার তাদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেন। জমিদার তন্ত্র যেহেতু রাজতন্ত্রের হাত ধরে আসে, তাই তাদের মধ্যে রাজ পরিবারের অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। ভাবনাচিন্তা, প্রাচুর্য, লৌকিকতা, ধর্মচর্চা ছিল মূলত তাদের প্রতিপাদ্য। রাজস্ব সংগ্রহ করা, রাজকোশে রাজস্ব পরিশোধ করা, সমস্ত কিছুর উন্নতি সাধনে জমিদার পরিবারগুলি দায়িত্বশীল থাকতেন। জমিদারগণ একদিকে বিচার কার্যও সম্পাদন করতেন অপরদিকে বহুবিধ সামাজিক ভূমিকা পালন করতেন। আমরা এখানে এই প্রবন্ধে তেমনই তিনটি জমিদার বাড়ি প্রসঙ্গে আলোকপাত করব। অন্যান্য জমিদার বাড়ির মত এগুলি এতটা প্রচারিত বা জনশ্রুতি যুক্ত নয়। অর্বাচীন এই জমিদার বাড়িগুলি নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে সামান্য কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১

হরধাম জমিদার বাড়ি

নদিয়া জেলার রানাঘাট ১ নম্বর ব্লকের অধীনস্ত চূর্ণী তীরবর্তী হরধাম গ্রামটির বর্তমানে সৌন্দর্য বা সমৃদ্ধি কোনটিই তেমনভাবে চোখে পড়ে না। কিন্তু ইতিহাসের ধারায় এই স্থানটির গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। এই হরধাম এবং নিকটবর্তী চূর্ণী নদীর অপর প্রান্তের আনন্দধাম গ্রামদুটিতে নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭২৮-১৭৮২ খ্রি:) কর্মকাণ্ডের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ী ছিল এখানে। উৎসব-অনুষ্ঠানে মহাসমারোহে বিরাজ করত এই দুটি গ্রাম। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হরধামে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনি গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মাঝেমধ্যে এই প্রাসাদে এসে থাকতেন। এই প্রাসাদের ঐতিহ্য কোন অংশে কম ছিল না। গত ২০০০ খ্রিস্টাব্দেও এর কিছু অংশ দেখা যেত। বর্তমানে রাজবাড়ীর উঁচু ভিটা ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান হয় না।

এই রাজবাড়ীর অনতিদূরেই হরধাম রায়বাড়ি অবস্থিত। স্থানীয় পাকা সড়কের পাশে বকুলতলা থেকে এই জমিদার বাড়ির সূচনা। রাস্তা থেকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সেই পুরানো দিনের দালান। এই বাড়িটিই সাক্ষ্য বহন করে সেদিনের জমিদার প্রথার। হরধামের রাজপরিবার ছাড়া এই গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা পশ্চিম দেশীয় আহিরি গোপসন্তান। পূর্বে এদের পূর্বপুরুষগণ রাজ সংসারে চাকরি করতেন এবং তখন থেকে তারা লক্ষ্মী দেবীর কৃপার অধিপতি হন। এই পরিবারের বর্তমান অন্যতম অভিভাবক শশাঙ্ক শেখর রায়ের[১] নিকট থেকে জানা যায়, প্রায় চারশত বছর আগে এই বংশের অন্যতম পুরুষ যশোবন্ত রায় বেনারস থেকে এসে ছোট একটি ঘরে বাস করতেন। তিনি পার্শ্ববর্তী কোন এলাকার রাজবাড়ীর অন্যতম কর্মচারী ছিলেন। উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এটি অনুমান করা যায় তিনি পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণচন্দ্র রাজপরিবারের অধীন হরধাম রাজবাড়িতে কাজ করতেন। রাজবাড়ির প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। সেখানে কাজ করার সুবাদে তিনি বেশকিছু অর্থ সঞ্চয় করে উক্ত এলাকার জমিদারি ক্রয় করতে শুরু করেন। মূলত এই সময় থেকে হরধাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদারতন্ত্রের সূচনা ঘটে। এই সময়ে এই যশবন্ত রায় অনেক জমি এবং এলাকা নিজের কারায়ত্ব করেন এবং তার ছোট্ট কুটিরকে অট্টালিকার রূপ দিতে থাকেন। তারপর তার পুত্র কালিনাথ রায় লক্ষ্মীর কৃপা বলে আরো উন্নতি করতে থাকেন। তিনি ছিলেন সেই সময়ের উক্ত

এলাকার একজন প্রতাপশালী জমিদার।

জমিদার বাড়ীর চতুর্দিকে চারটি বড় মাপের সুন্দর গৃহের নির্মাণ তিনি শেষ করেন[২]। যার একটি গৃহ এখনো বর্তমান। বাড়িটির সামনে দাঁড়ালে রোমাঞ্চিত হতে হয়। যেন কত ঘটনার সাক্ষী এই দালান ঘরটি। ভিতরে আংশিক সংস্কার করে বর্তমানে পরিবারের সদস্যরা এখানে বসবাস করছেন। কথিত আছে, চতুর্দিকে নির্মিত দ্বিতল এই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ মিলে মোট বাহাত্তরটি ঘর ছিল। অন্দরমহল, বাহিরমহল, গোশালা, নহবৎখানা, ঠাকুরদালান, ফুলের বাগান এখানে নির্মাণ করা হয়েছিল রাজবাড়ির আদলে। অন্দরমহলে মহিলারা থাকতেন এবং বাহিরমহলে বিভিন্ন পূজা, কর্মচারী নায়েব পাহারাদার প্রমুখেরা থাকতেন। নহবৎখানা ছিল উপরে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে নহবৎখানাতে বাজনা বাজত। নারায়ণ পূজা, দোল পূজা ও উৎসব, শক্তির আরাধনা এগুলিই ছিল সে সময়ের প্রধান উৎসব। পার্শ্ববর্তী গ্রাম নন্দীঘাট থেকে ব্যানার্জিদের পূর্বপুরুষেরা এখানে পূজাদি সম্পন্ন করতেন। নাটক, ঢপ, খেমটা, টপ্পা প্রভৃতি নাচ গানের প্রচলন ছিল তখন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রবর্তনের আগে জমিদার বর্গের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য অপরিবর্তিত থাকলেও ভূমিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কাঠামোতে মাঝে মাঝে কিছু পরিবর্তন করা হয়। সরকারি রাজস্ব সর্বাধিক করা ও রাজস্বের নিয়মিত পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত ধরনের জমিদারদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। সেই সূত্র ধরে এই ধরনের ছোট ও মাঝারি জমিদারদের অন্যতম কাজ হয়ে ওঠে দক্ষতার সাথে রাজস্বের আদায় ও সংগ্রহ নিশ্চিত করা। রাজস্ব ব্যবস্থাপকের ভূমিকা থেকে জমিদার নামে এই পর্যায়ে তারা স্বীকৃত হয়। হরধাম জমিদার বাড়ির রাজস্ব আদায় হত মূলত আবাদযোগ্য জমি, বনভূমি ও জলাভূমি থেকে। তাছাড়া জরিমানা, বাজেয়াপ্ত থেকেও খাজনা নির্ধারিত হত। এসব পরিচালনা ও হিসাবের জন্য নানাবিধ পদমর্যাদার ব্যক্তি থাকতেন। তারা দক্ষতার সাথে এসব কাজ সম্পন্ন করতেন।

জমিদার কালীনাথ রায়ের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম হরিনাথ রায়। তিনিও তাঁর পিতার মতো দক্ষতার সাথে জমিদারি কার্য সম্পাদন করতেন। মা লক্ষ্মীর কৃপা বলে জমিদারি তখন নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও এই জমিদার বাড়ির খ্যাতি ইতিমধ্যেই সঞ্চারিত হয়। কিন্তু জমিদার হরিনাথ রায় ছিলেন নিঃসন্তান। এই বিলাসবহুল অট্টালিকায় সম্পদের প্রাচুর্যে তিনি যতটা না আনন্দিত তার থেকে নিজের সন্তানের অভাবে তিনি ততটাই হতাশাগ্রস্ত। সেই চিন্তায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। পরিবারের সম্মতিক্রমে তিনি কেদারনাথ রায় নামে এক সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই পোষ্যপুত্রকে তিনি তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় মহাশয় একজন বিনয়ী ব্যক্তি ছিলেন। 'নদিয়া কাহিনী' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় কুমুদনাথ মল্লিক এ কথা উল্লেখ করেছেন। এই জমিদার বংশের মধ্যগগন ছিল এটি। নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, লাঠিয়াল, পালকিবাহক, পাচক সবাই জমায়েত থাকত এই বিশাল জমিদারিতে।

এই সময় জলদস্যুদের আক্রমণ বাড়তে থাকে। জমিদারগণ নিজ নিজ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার জন্য অতিমাত্রায় দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে এইসব জমিদার অভিজাতবর্গের উপর সংশ্লিষ্ট নবাবের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিকে নবাব, মারাঠা আর অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রভৃতির সঙ্গে সংঘাতে জন্য জমিদারেরা তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করতে থাকে। একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে জমিদার পরিবারগুলি উপযুক্ত অভিভাবকের বশ্যতা স্বীকার না করে স্বাধীন হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময় জমিদারগণ সুবিধাভোগী উত্তরাধিকারমূলক অবস্থানের সুবাদে তাদের নিজস্ব জমিদারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, বিচার ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত জীবন ধারা গড়ে তোলে আর জাঁকজমকপূর্ণ প্রাচুর্য বিলাসিতায় একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই ধরনের জমিদার শ্রেণির সামাজিক কার্যকলাপ সাধারণত তাদের নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। এই বিলাসী জীবন ধারার জন্য মিহি সুতিবস্ত্র, পণ্য, রত্নালংকার, অন্যান্য শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্পের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও জমিদার পরিবারের ব্যয়বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায়[৩]। শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় হরধাম জমিদার বাড়ির অন্যতম ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেন এই সময়। বিভিন্ন প্রতিবেশী জমিদারদের সাথে রায় মহাশয়ের পরিচয় ছিল প্রতিষ্ঠিত।নানা ক্ষেত্রে তিনি এই শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় দেন।

কিন্তু ঠিক এই সময় হরিনাথ রায়ের ভগ্নীপুত্র বেণীমাধব রায় বড় উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে থাকেন। তিনি

মনোনীত উত্তরাধিকার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বাবুকে সেইভাবে মান্যতা দিতেন না। তিনি এই জমিদারি পরগনার মধ্যে পৃথকভাবে পরিচালিত হতেন। এই দিকে জমিদারি যেন বিভক্ত হয়ে পড়ে। তিনি প্রজা কল্যাণ বা খাজনা আদায়ে তেমন আগ্রহ দেখাতেন না। তিনি আপন সুখে প্রমোদ নিরসনে অধিকতর ব্যস্ত থাকতেন। মূলত রায় বাড়ির প্রমোদমহল বা নহবতখানাতে তার অধিকার ছিল বেশি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বাইজি বা নৃত্য প্রদর্শনকারীরা অর্থের বিনিময়ে এখানে আসতেন তাদের অভিনয় প্রদর্শন করতে। তার এই আত্মসুখ বা বিলাসিতা জমিদারি প্রথার পতনকে দ্রুত ত্বরান্বিত করে। জমিদার বাড়ির কোষাগারের অনেক অর্থ তিনি এই ভাবে ব্যয় করতে থাকেন। এর ফলে জমিদার বাড়ির অভ্যন্তরীন অশান্তি তীব্রতর হয়।

অন্যদিকে কেদারনাথ রায় ছিলেন একজন উদারচেতা ও মহানুভব ব্যক্তি[৪]। তিনি দত্তক পুত্র হিসেবে মনোনীত হলেও এই বংশের প্রতি তার আনুগত্য প্রশংসনীয়। জমিদারি প্রথাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি বদ্ধমূল। তিনি দুহাতে প্রজাদের জন্য দান করতেন অর্থসহ বিবিধ খাদ্যদ্রব্য। তিনি প্রজা কল্যাণকর দরদি জমিদার হিসেবে প্রসিদ্ধ হন। তার মধ্যে ধর্মীয় মানসিকতার পরিচয় মেলে। তিনি জমিদার বাড়ির সম্মুখভাগে বকুল গাছের তলায় মহিষমর্দিনী পূজার প্রচলন করেন। মন্দির, চাঁদনী তার আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যাত্রা, টপ্পা, খেমটা প্রভৃতি ধরনের সাধারণ মনোরঞ্জন কর বিষয়গুলি এই সময় হতে দেখা যায়। পাশেই তিনি ঘোড়ার হাট, সবজির বাজার বসিয়েছিলেন। সবজি, মাছ, মিষ্টির দোকান এখানে থাকায় সবকিছু পাওয়া যেত হাতের নাগালেই। তিনি এলাকাবাসীর কাছে এই জন্যই 'বাবু' খেতাব পেয়েছিলেন।

হরধাম জমিদার বংশ তালিকা

যশোবন্ত রায় > কালিনাথ রায় > হরিনাথ রায় ও ভগিনী (ভগিনী পুত্র- বেনীমাধব রায়) > কেদার নাথ রায় (দত্তকপুত্র)> প্রমথনাথ রায়> পটেশ্বরী রায় (কন্যা) > শশাঙ্কশেখর ও শুভেন্দুশেখর।

শুধু তাই নয়, তার উদ্যোগে কর্মচারীদের আবাসঘর নির্মিত হয় এখানেই। বর্তমান বাড়ির পিছনে যে পরিত্যক্ত আমবাগান, উক্তস্থানেই ছিল কর্মচারীদের বাসগৃহ। এই বাড়িটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল 'রায়পাড়া'। সামনে মূল সিংহদরজা, ফুলের বাগান, পূজার মন্দির সবমিলে এটি ছিল ক্ষুদ্র একটি রাজবাড়ির সংস্করণ। বাড়িটিও দেখতে বেশ সুন্দর ছিল। বর্তমানে একটি দালানের অস্তিত্ব আছে। পাশের চিত্রে তা দৃশ্যমান। ভবনটি ছিল মূলত দ্বিতল। কড়িবরগার ছাদ। পুরানো দিনের ইট দিয়ে তৈরি। মূল প্রবেশপথটি খুব প্রশস্ত নয়। জানালা-দরজায় কিছু পুরনো দিনের নকশার বৈশিষ্ট্য মেলে। বাড়ির ভিতরে বেশ কিছু সংস্কার হলেও বাইরের দালানটি অবিকৃত অবস্থায় আছে। কথিত আছে, মূল দরজায় দিনে ও রাতে ২০ জন লাঠিয়াল থাকতেন[৫]। রাতে লণ্ঠনের আলো জ্বলত। পাহারার ব্যবস্থা ছিল। ঝাড়লণ্ঠন, হাতির শিকল প্রভৃতি থেকে বোঝা যায়, পূর্বে এই বাড়িতে হাতিও থাকত। এর মাঝে কেদারবাবুর দানধ্যান অক্ষুন্ন থাকে।আয়ের থেকে ব্যয় বাড়তে থাকে এ সময়। তার হাতেই জমিদারি ঐতিহ্য ম্রিয়মাণ হতে শুরু করে।

বাবু কেদারনাথ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রমথনাথ রায় (ঝড়ু বাবু) জমিদারি বুঝে নেন। যেহেতু, জমিদারি তখন ক্রম হ্রাসমান। তাই তিনি তার অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারেননি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। বহু বাঘ শিকারের গল্প তার সম্পর্কে জানা যায়। শিকার করা বাঘের একটি ছাল আজও ঘরের মধ্যে বাঁধানো অবস্থায় আছে। পাশের চিত্র থেকে পাঠকেরা অনুমান করতে পারেন। ১৩৬২ বঙ্গাব্দে জমিদারি প্রথা তার আমলেই শেষ হয়। সরকার ও রায়তের মধ্যে মেলবন্ধনকারী এই স্বত্তার বিলোপ ঘটে সেই সময় থেকে। পরবর্তীতে তিনি হরধাম ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হন। এই প্রমথবাবুর পটেশ্বরী রায় নামে এক কন্যা ছিলেন। তিনি এই পরিবারেই কাটিয়েছিলেন বিবাহ পরবর্তী জীবন। বর্তমানে এই পটেশ্বরীদেবীর দুই পুত্র শশাঙ্কশেখর ও শুভেন্দুশেখর ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবার কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। গত পুজোর সময় শশাঙ্কশেখর বাবু পরলোকগমন করেন।

জমিদার কর্তাদের বিলাসিতা, জমিদারি অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা না করা, ঋণ জালে জড়ানো প্রভৃতি কারণে জমিদার অট্টালিকার চার-পঞ্চমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিবারের অন্যান্য ভাগীদারেরা অনেক সম্পদ হস্তগত করেছেন। আজও

জমিদার ভবনের সম্মুখভাগ বর্তমান। এই বাড়ির দোতলায় কাঠের নরসিংহ মূর্তি, বাঘের ছাল, টানা পাখা, ঝাড়লন্ঠন প্রভৃতি এখনও দেখা যায়। বাড়ির ভিতরেও অপর দালানের কিছু অংশ আজও অবশিষ্ট। এই বংশের বর্তমান পুরুষেরা ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সাক্ষী করে আমাদের মতো সাধারণ জীবনযাপন করছেন। এখনও প্রতিবছর শীতকালে হরধাম জমিদার বাড়ির আমবাগানে নদীর পাড়ে অনেকে বনভোজন করতে আসেন। তখন এই জমিদার বাড়িকে কাছের থেকে দেখবার লোভ তারা সংবরণ করতে পারেন না। অবলীলায় দলবেঁধে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণে। মুগ্ধ নয়নে সবাই দেখে, ছবি তোলে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো বাধা দেওয়া হয় না। এভাবেই কয়েক শতকের ইতিহাস আজও রয়ে গেছে হরধামবাসীর হৃদয়ে।

২

বৈদ্যপুর জমিদার বাড়ি

এবার আমাদের আলোচনার বিষয় বৈদ্যপুর এলাকার জমিদারি নিয়ে। এখানেও সেই অর্থে কোনো বৃহত্তর জমিদার ছিলেন না। পার্শ্ববর্তী তাতলার ঘোষাল এবং রানাঘাটের পালচৌধুরীরা ছিলেন সে সময়ের প্রতিষ্ঠিত জমিদার। এখানে যারা জমিদারি করেছেন তারা মাঝারি মানের জমিদার। কথিত আছে আজ থেকে ৩০০ বছর পূর্বে পার্শ্ববর্তী রানাঘাটের পালচৌধুরী জমিদারদের এক অন্যতম সদর দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি জমিদারির অধীনে থেকে হিসাব নিকাশের কাজ করতেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী, তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন না। জমিদারির প্রধান দেওয়ান হওয়ার সূত্রে তিনি অনেক অর্থ, সম্পদ আত্মসাৎ করেন। অনেক সম্পদ নিজের নামে করে নেন। তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে থাকেন। তিনি সাধারণ কর্মচারী হয়েও জমিদারের মতো জীবন কাটাতেন। স্থানীয় ব্যক্তি ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[৬] তাঁর সম্পর্কে একটি গল্প বলেন। ইংরেজ আমলে জমিদারদের নিয়ে সেরেস্তার সভা হয়। তখন রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দেওয়ান হয়েও হাতির পিঠে করে সভা মাঝে যান। সাথে বরকন্দাজ সহ সবাইকে নিয়ে যান। সেই সভায় পৌঁছালে ইংরেজ কর্তা তাকে জিজ্ঞেস করেন- 'ইয়ে কোন মুকাম কা জমিদার হায়?' রামচাঁদ বাবুর হাফভাব তৎকালীন বড়লাট সন্দেহের চোখে দেখেন। তিনি বুঝতে পারেন রামচাঁদ বাবু অর্থসঙ্ক্রান্ত দুর্নীতির সাথে যুক্ত। এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে তিনি রামচাঁদ বাবুর সম্পদের তদন্ত করতে তদন্তকারী দল পাঠান। যখন তদন্তকারী দল এই বৈদ্যপুর এসে পৌছল, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তিনি পায়খানা ঘরে যান এবং সেখানে হীরের আংটি চুষে আত্মহত্যা করেন। পরে তার এক কন্যা এই সম্পদের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু তিনি তা রক্ষা করতে পারেননি। কিছুদিন আগেও বটগাছের নিচে প্রথম জমিদারের কিছু নিদর্শন ছিল। কিন্তু বর্তমানে আর নেই।

এই ঘটনার পর রানাঘাটের পাল চৌধুরী পরিবার বৈদ্যপুর স্বতন্ত্র জমিদারি স্বীকৃতি দেন। জমিদার হন হরিপদ মৌলিক। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বর্তমান হাইস্কুলের সম্মুখভাগে এই জমিদার ভবন ছিল। ভবনসংলগ্ন পুকুরটি এখনও দৃশ্যমান। স্থানীয় মানুষেরা জানান, এই পুকুরটি দীর্ঘদিনের পুরনো। পুকুরটি পদ্মপুকুর নামে পরিচিত। এই পুকুরটি আগে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। অর্থাৎ জমিদার বাড়ির মহিলাদের স্নানের পুকুর ছিল এটি। তখন পুকুর পরিষ্কার ছিল। এক পাশে পদ্মফুলও ফুটত। এই পুকুরের পাড়ে রাস্তার বিপরীত দিকে ছিল মূল জমিদার বাড়ি। বর্তমানে গ্রামের যারা বর্ষিয়ান তারা তাদের ছোটোবেলায় এখানে দালান দেখেছে। প্রাচীন আমলের ইট, চওড়া ভিত কিছুদিন আগে পর্যন্তও এখানে ছিল। এখন স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ গাছপালায় ভর্তি। পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়ে একটু এগোলেই ডানদিকে বর্তমানে শান্তি বিশ্বাসের বাড়ি। বাড়ির উঠোনে দাঁড়ালে দেখা যাবে আর একটি পুকুর। পুকুরের উল্টোদিকে কলা বাগানের ভিতর এখনো ৩০ ইঞ্চি চওড়া দেওয়ালের কিছু অংশ। এখানেও ছিল অতীত দিনে জমিদার বাড়ির অপর সুসজ্জিত দালান। মূলত এটি ছিল প্রমোদমহল। বাড়ির মহিলা সদস্যদের এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। গান-বাজনা, পূজা-পার্বণ সব এখানে হত। জমিদার হরিপদ মৌলিক একজন অতি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তার সাথে অন্যান্য জমিদারদের সুসম্পর্ক ছিল খুব ভালো। এই জঙ্গলাকীর্ণ জনপদ বৈদ্যপুরের উন্নতির জন্য তিনি ভাবনা চিন্তা করতেন। পুকুর খনন, পথঘাট নির্মাণ সেই সময় থেকে

শুরু হয়। হরিপদ মৌলিক প্রয়াত হলে তার অন্যতম পুত্র যাদব মৌলিক জমিদারি বুঝে নেন এবং রাজস্ব আদায় করতে শুরু করেন। কিন্তু যা হয়! কালের নিয়মে এই জমিদার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সম্পদ ভোগ করতে শুরু করেন। প্রমোদমহলের নানা প্রমোদক্রিয়ায় তারা যুক্ত হন। সারাদিন লিপ্ত থাকতেন এই সব কাজে। জমিদারি আর সে ভাবে রক্ষা পায় না। এই সময় গ্রামে ওলাওঠার প্রভাব আসে। বহু লোকের সাথে জমিদার পরিবারের অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। এই পরিবারের শেষ উত্তরসূরি ছিলেন রেনুবালা দেবী।

পরবর্তীতে এই মৌলিক পরিবারের সাথে সম্পর্কিত হয়ে আরও দুটি জমিদার পরিবারের পত্তন হয় এই গ্রামে। একটি চক্রবর্তী পরিবার, অপরটি চট্টোপাধ্যায় পরিবার। প্রথমে আলোকপাত করি চক্রবর্তী পরিবার নিয়ে।

বৈদ্যপুরের জমিদার হরিপদ মৌলিকের অন্যতম পুত্রের সাথে বাগ আঁচড়া নিবাসী মিনতিবালা দেবীর বিবাহ হয়। তাদের এক পুত্র সন্তান হয়। পরে সেই পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়। পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর মিনতিবালার মন ভেঙে যায়। তখন তিনি তার অপর বোন মমতারানী চক্রবর্তীকে বৈদ্যপুরে চলে আসার জন্য পত্র লেখেন। মমতারানী দেবী এবং তার স্বামী সুধাসিন্ধু চক্রবর্তী বাগ আঁচড়ার জমিদারির কিছু অংশ বিক্রয় করে বৈদ্যপুরে চলে আসেন। পুত্র ও স্বামীর শোকে পাথর হয়ে একদিন মিনতিবালা দেবী প্রয়াত হন। তখন এই জমিদারের কিছু অংশ চলে যায় তার পিতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। সে সময় জমিদারির অনেক অংশই মৌলিকদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। বর্তমান হাই স্কুল থেকে বাজার পর্যন্ত এই সীমানা চক্রবর্তীদের হাতে ছিল। পরে তাতলার ঘোষালদের নিকট থেকে কিছু সম্পদ কয় করেন। গ্রামে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্মৃতিফলকে মমতা রানী চক্রবর্তীর নাম অলংকৃত। সে সময় এই বৈদ্যপুর গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বিদ্যাশিক্ষার তেমন কোনো চল ছিল না। তবে গ্রামে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বসবাস বাহুল্য ছিল। মহিলাদের উন্নয়ন ও গ্রামে শিক্ষা প্রসারের জন্য মমতা রানী চক্রবর্তীর সবিশেষ ভূমিকা ছিল। এই জমিদার বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। সিংহদরজা পরিবেষ্টিত পাচিল দেওয়া একতলা বাড়ি ছিল। দূর্গাপুজা সহ বেশকিছু উৎসবের নিদর্শন পাওয়া যায়। জমিদার প্রথা বিলোপ হবার সাথে সাথে এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটাই কমতে শুরু করে।

এবার আসি বৈদ্যপুরের অপর প্রভাবশালী পরিবার প্রসঙ্গে। এই পরিবারের প্রথম পুরুষ ছিলেন তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। নৈহাটিতে তাদের আদি বাস ছিল। তারকনাথের পিতা দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হবার পর শৈশবে তিনি এই বৈদ্যপুর গ্রামে তার এক দিদির কাছে চলে আসেন। নৈহাটিতে থাকলে তারকনাথের জীবনযাপন সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়ার আশঙ্কায় তার নিঃসন্তান দিদি তাকে প্রতিপালন করতে থাকে। প্রথম দিকে তিনি জমিদার হরিপদ মৌলিকের অধীনে কাজ নেন। তারপর কিছু অর্থের সংস্থান করে কিছু জমি ক্রয় করেন এবং ছোট জমিদার হিসেবে প্রসিদ্ধ হন। তারকনাথ আপন নিষ্ঠা ও অদম্য পরিশ্রম করে তিনি সম্পদ গড়ে তোলেন এবং প্রতিষ্ঠিত হন।

সেসময় এই বাড়িতে সব ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান হত। কালীপূজা, দুর্গাপূজা ছাড়াও অন্যান্য উৎসব হতে দেখা গেছে। পরিবারের প্রতিষ্ঠিত নারায়ন শিলা মন্দির আজও বর্তমান প্রজন্ম কর্তৃক পূজিত হয়ে চলেছে। প্রতিদিন পূজা ও নিত্যসেবা অনুষ্ঠিত হয়। যখন আমাদের দেশ থেকে জমিদার প্রথার বিলোপ ঘটে, ঠিক সেই সময়েই তারকনাথ প্রয়াত হন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য বিলুপ্ত হতে থাকে। খাজনা আদায়ের জন্য গোরুর গাড়ি, পালক্ ঘোড়া বাড়িতেই মজুত থাকত। পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, তিনিও এই বাড়িতে ঘোড়ার সাজ দেখেছেন। অনেকদিন পর্যন্ত এগুলি ছিল। তা থেকে অনুমান করা যায় এই পরিবারে ঘোড়া প্রতিপালন করা হত। লাঠিয়ালদের জন্য পৃথক ঘর ছিল। কিন্তু কালের নিয়মে সে সব এখন অতীত।

সম্পদশালী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৬ পুত্র ছিল। তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি নানা ধরনের সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত থেকেছেন। বৈদ্যপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তার উল্লেখযোগ্য যাত্রাপথ। আজও বৈদ্যপুর গ্রামে প্রবেশ করার সময় ডান দিকের পুকুর পাড় থেকে বাজারের বটগাছ পর্যন্ত সেই সময়ের নানান স্মৃতি উঁকি দিতে থাকে। একটি পুরনো দালানবাড়ি আজও বৈদ্যপুর গ্রামের অপর জমিদার বাড়ির নিদর্শন হয়ে জেগে থাকে।

৩

আনুলিয়ার জমিদার বাড়ি

এবার আসি আলোচ্য প্রবন্ধের তৃতীয় এবং শেষ অংশে। এই অংশে আলোচনার বিষয় আনুলিয়ার জমিদার বাড়ি। আনুলিয়া গ্রামের নিকটেই রানাঘাট শহর। এই রানাঘাটে পালচৌধুরী সহ অন্যান্য কতিপয় জমিদার বাড়ি ছিল। আনুলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রানাঘাটের পাল চৌধুরীদের প্রত্যক্ষ নজরদারিতে ছিল। তাই হরধাম বা বৈদ্যপুরের মতো এখানে স্ব-শাসিত জমিদার সেভাবে উল্লেখিত হয়নি।

রানাঘাট পাল চৌধুরীদের অধীনে সর্বচন্দ্র রায় আনুলিয়ার জমিদারি প্রাপ্ত হন[৭]। তাঁর শেষ বংশধর ছিলেন সরসীগোপাল রায়। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করায় সকলে তাকে গোরাস্যার বলতেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। বর্তমানে যেখানে উচ্চ বিদ্যালয় সেখানেই ছিল পূর্বেকার আনুলিয়া জমিদার বাড়ি। এই পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ভবন বিদ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। পাশেই ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। এখনও একটি খড়্গ আছে পরিবারের কাছে সংরক্ষিত। এখনও পূজার সময় নির্দিষ্ট দিনে এটি ব্যবহার করা হয়। এই জমিদার বংশের পূর্বতনেরা এই আনুলিয়া মহালে অনেক কিছু নির্মাণ করেছিলেন। আজও এই গ্রামে উল্লেখযোগ্য স্মৃতি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ছয় স্তম্ভের এক দালান। অনেকের মতে এখানেই ছিল জমিদার বাড়ির নটি মহল।নাচ গান আনন্দ প্রমোদের জন্য এই দালান নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এসবের পক্ষে তেমন কোনো প্রমাণ মেলে না। তবে এই দালান গ্রামের দীর্ঘদিনের ইতিহাস বহন করে চলেছে। বিষ্ণুমূর্তির কাছে এই চাঁদনীর নিদর্শন সকলে কৌতূহল চোখে দেখে নেয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পুরানো জমিদারদের জায়গায় নতুনদের জমিদার হবার সুযোগ ছিল। কিন্ত যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইন কার্যকর হয় তা ফলপ্রসূ হয় না। নতুন জমিদার ও পুরানো জমিদারদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য ছিল না। তারা নিজেরা একে অপরের পরিপূরক ছিল। জমিদারগণ এই পর্বে অধিকমাত্রায় ভোগবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। তারপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি জমিদার বাড়িগুলি। প্রশাসনিক নিয়মে হারিয়ে যায় অতীত স্মৃতি সকল।

সূত্র নির্দেশ:

১. সাক্ষাৎকার: শশাঙ্কশেখর রায়, বয়স: ৭৫ বছর, পেশা: ব্যবসা, ঠিকানা: হরধাম, নদিয়া, তারিখ: ৬ জুলাই ২০২১।

২. বিশ্বাস, সুজিতকুমার, (২০০৪), *পায়রাডাঙ্গা: নানা প্রসঙ্গ (আনুলিয়া, হরধাম, বৈদ্যপুর সম্বলিত),* চরভূমি প্রকাশন, পৃ. ৪০-৪২।

৩. মল্লিক, কুমুদনাথ, (১৯৯৮), *নদীয়া কাহিনী,* (মোহিত রায় সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, পৃ. ১২২।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস, (১৯৯৫), *উনিশ শতকের রানাঘাট,* সাহিত্যশ্রী, পৃ. ৬৪।

৫. চট্টোপাধ্যায়, রামানুজ, (১৯৯৭), (সম্পা.), *বৃহত্তর রানাঘাট: সেকাল থেকে একাল,* জাতক, পৃ. ৮৬।

৬. সাক্ষাৎকার:ভবানীপ্রসাদ চ্যাটার্জী, বয়স: ৬০ বছর, পেশা: ব্যবসা, ঠিকানা: বৈদ্যপুর, নদিয়া, তারিখ: ১২ জুলাই ২০২১।

৭. সাক্ষাৎকার: কাজল চ্যাটার্জী, বয়স: ৭০ বছর, পেশা: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ঠিকানা: আনুলিয়া, নদিয়া, তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২।